# হাজি মহম্মদ মহসীন





ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

তিন আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ১২

# হাজি মহম্মদ মহসীন

বিদ্যাসাগর, মাইকেলমধুসূদন, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৩২৬

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ও

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



# হাজি মহম্মদ মহসীন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের কোটী কোটী মানুষের ভিতরে কোন্‌খান দিয়া কাহার মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিয়া যে একদিন তাঁহাকে সকল মানুষের উপরে তুলিয়া দেবতার আসনে বসাইয়া দেয়, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

ভগবানের এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে প্রাণী-জগতের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলিয়া পরিচিত। যে সকল সৎ ও মহৎ গুণের জন্য দেবতারা "দেবতা" নাম পাইয়া সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া থাকেন মানুষের ভিতরেও ভগবান কম বা বেশী পরিমাণে সেই সকল গুণ দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। অন্য কোন প্রাণীর ভিতরে তাহা দেন নাই। এই কারণেই ভগবানের বিশ্ব-সাম্রাজ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভগবানের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি এই মানবের মধ্যে আবার যাঁহারা সেই সকল গুণরাশি নিজের জীবনে অন্যের অপেক্ষা বেশী রকম ফুটাইয়া তুলিয়া মানব-সমাজের কোন না কোন প্রকার মঙ্গল সাধন করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারাই—মানুষ হইয়াও—এ সংসারে দেবতার মত 'মহাপুরুষ' নাম পাইয়া চিরকাল জগৎ-সংসারে সকলের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিয়া থাকেন।

এ সংসারে মানুষের কার্য্য অনেক, এ সংসার মানবের কর্ম্মক্ষেত্র। এ সংসারে আসিয়া মানবকে অনেক কার্য্য করিতে হয়, পদে পদে নানা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়—তাই ভগবান তাহাদিগকে সেই

সর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য, নানাপ্রকার গুণরাশিতে মণ্ডিত করিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সব গুণরাশির বিকাশকেই মনুষ্যত্ব বলে, এবং এই মনুষ্যত্ব যাঁহার ভিতরে যত অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠে, তিনিও সেই পরিমাণে জগতে অমর নাম এবং অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া লোক-সমাজে চিরকাল দেবতার মত পূজা পাইয়া থাকেন।

ইহাতে জাতি বিচার নাই, ইতর ভদ্র নাই, ধনী দরিদ্র নাই, ছোট বড় নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানব-মাত্রেরই ভিতরে কিছু না কিছু মনুষ্যত্বের উপযোগী সদ্‌গুণ বিরাজিত আছে এবং সেই জন্যই 'মানুষ' নাম। কিন্তু যিনি হেলায় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন তাঁহাকে এ সংসারে সকলের নীচে নামিয়া গিয়া, সকলের ঘৃণা ও বিরাগ-ভাজন হইয়া যেমন মনোকষ্টে কাল কাটাইতে হয়, পরলোকেও তেমনি শাস্তিও বড় কম ভোগ করিতে হয় না। এই কর্ত্তব্যে অবহেলার নামই—পাপ, সুতরাং পাপের যে সাজা তাহা ইহকাল এবং পরকাল, উভয়কালেই সমান-ভাবে ভোগ করিতে হয়।

আর এই কর্ত্তব্যপালনের নামই—পুণ্য। সুতরাং যিনি মানুষ হইয়া, যেমন ভাবে, যতটুকু তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতে পারেন, তিনি সেই রকমই পুণ্যের অধিকারী হইয়া উভয়কালেই সেইরূপ পুরস্কার পাইয়া থাকেন।

এই জন্যই সকল দেশে সর্ব্বকালেই যাঁহারা সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, এবং কি দেশে কি বিদেশে সমগ্র মানব-জাতির শ্রদ্ধা-ভক্তির পূজা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যে একসময়ে সাধারণ মনুষ্যরূপে জন্মিয়া শেষে মানুষের সকল প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া—সেরূপ দেবতার সমান হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাই "হাজি মহম্মদ মহসীন"ও সামান্য মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ "মহাপুরুষ" নামে সমগ্র মানব-সমাজে দেবতার মত উচ্চ আসন লাভ করিয়া সকলের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তির পূজা লাভ করিতেছেন, এবং যতদিন দেশে মানুষ থাকিবে, মানুষের ইতিহাস থাকিবে—ততদিন যে তাঁহার নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, একথা ধ্রুব সত্য।

পয়সা থাকিলেই যে লোকে যথার্থ বড়লোক হয় তাহা নহে। ধনকুবের তো এ সংসারে অনেকেই হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক এসংসারে প্রকৃতপক্ষে "বড় লোক" হইয়া দেশে অক্ষয়-কীর্ত্তি এবং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া যাইতে পারেন? মানুষ যথার্থ বড় লোক হইতে পারে কেবল প্রবৃত্তির গুণে। যাঁহার প্রবৃত্তি উচ্চ তিনিই বড় মানুষ। নতুবা হীন-প্রবৃত্তি লইয়া কোটীপতির ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, তিনি কখনও বড় লোক হইতে পারেন না।

কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি উচ্চ থাকিলে তাঁহার চরিত্র ক্রমে মহৎ এবং উদার হইয়া উঠে এবং চরিত্র উদার, উচ্চ এবং মহৎ হইলে তাহা হইতে যখন আপনা আপনি তাঁহার মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে—তখনই তিনি কেবল "বড় লোক" হইতে পারেন। হাজি মহম্মদ মহসীনও এইরূপ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বড় লোক হইয়া গিয়াছেন বলিয়া, আজ তিনি সংসারে আদর্শস্থল হইয়াছেন এবং মানব-সমাজে এইরূপ উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই চিরকাল সংসারে তিনি যেরূপ অমর হইয়া রহিয়াছেন, সেরূপ অমরত্ব দেবতাদিগের পক্ষেও দুর্ল্লভ। তাই মহম্মদ মহসীনের পুণ্যময় জীবন-চরিত আলোচনা করিলে, ধর্ম্ম পুণ্য, মনুষ্যত্ব —সমস্তই লাভ হয়।

সকল জাতির সকল শাস্ত্রেই সকল প্রকার ধর্ম্মপুস্তকেই "দান"কে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যের হৃদয়ে যে

প্রবৃত্তি বলবান হইয়া জাগিয়া উঠিলে এই দান-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে সেই প্রবৃত্তিই মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ। এই শ্রেষ্ঠ গুণের নাম 'দয়া'।

কারণ এই 'দয়া'-প্রবৃত্তি হইতেই মানুষের মনে সর্ব্বপ্রকার দানের ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, এবং একমাত্র দানের দ্বারা যেরূপ দেশের, সমাজের, সংসারের এবং মানবের উপকার সাধিত হইয়া থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না।

আর এই পরোপকার হইতেই সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমগ্র মানবসমাজের যথার্থ উন্নতি সাধিত হয়। যিনি এইরূপে দেশের, সমাজের ও মানবজাতির অশেষ কল্যাণ ও উন্নতি বিধান করিয়া যাইতে পারেন, তিনি মানুষ হইলেও যে যথার্থই দেবতার মত কার্য্য করিয়া "নরদেবতা" রূপে পূজিত হইবেন—তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

সুতরাং দয়া-গুণই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ এবং দান-ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই দয়া যাঁহার হৃদয়ে যে পরিমাণে জাগিয়া উঠে তিনিও মনুষ্যসমাজে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া অবশেষে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তখন সমগ্র মানবজাতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই নর-দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। হাজি-মহম্মদ মহসীনও আমাদের ভারতবর্ষে সেইরূপ নরদেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কারণ লোকসমাজের উপকারের জন্য দয়ায় বিগলিত হইয়া মহাপুরুষ মহসীন যেরূপ নিঃস্বার্থ-ভাবে অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল। তাই হাজি মহম্মদ মহসীন—দানবীর, তাই তিনি এ সংসারে যথার্থই **নরদেবতা**।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এদেশ এখন যেমন—পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। বিশেষতঃ দুইশত কি একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্ববিষয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ছিল। তখনকার কালের এদেশ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ শুনিলে এখন তাহা গল্পের মত বোধ হয়।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষেরও যেমন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে—দেশেরও তেমনি সকল বিষয়ে সকল রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এ শুধু এই ভারতবর্ষ বলিয়াই নয়, সকল দেশেই সমান।

বর্ত্তমানকালে "হুগলী"র নাম সকলেই শুনিয়াছেন। এই "হুগলী" একটি বড় জেলা। কিন্তু এই জেলার এই "হুগলী" নগর এখনকার কালে যেরূপ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে "কলিকাতা" একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী মহানগর বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, সে কালে এই "কলিকাতা"র নাম বড় কেহ জানিতও না। এমন কি কলিকাতা তখন বন জঙ্গল জলাভূমিতে পূর্ণ একটি সামান্য নগণ্য স্থান ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না।

তখন, এই "হুগলী" নগর অতি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। এই নগর গঙ্গার তীরে অবস্থিত থাকায়, তখন ইহা বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থল এবং শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। এই হুগলীর গঙ্গা তখন সর্ব্বদাই নানা দেশের নানাপ্রকার বাণিজ্য পোত সকলে পূর্ণ থাকিত এবং সহরও সর্ব্বদাই নানা প্রকার লোকের লীলাভূমি ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে মানুষের যেরূপ উন্নতি হইয়া থাকে, এমন আর অন্য কিছুতে হয় না, আর মানবসমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং "হুগলী" নগর সে সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি শ্রেষ্ঠ স্থান এবং উৎকৃষ্ট বন্দর ছিল বলিয়া সর্ব্বপ্রকারেই উন্নত এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই "হুগলী" বন্দরের নাম, একটি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া, দেশদেশান্তরে ঘোষিত হইত।

যে জায়গায় ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার সুবিধা হয়, যে জায়গায় সর্ব্বপ্রকার কারবার ভাল রকম চলিতে পারে, সেই জায়গাতেই নানা দেশ-দেশান্তর হইতে সর্ব্বপ্রকারের বণিকজাতি আসিয়া আপনাদের কার্য্যক্ষেত্র খুলিয়া বসেন। সুতরাং সেকালে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্টুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি বিদেশী বণিকগণ দলে দলে আসিয়া হুগলী নগরে আপন আপন কারবার চালাইবার জন্য দোকান খুলিয়া বসিলেন, এবং অনেকে সুবিধা বুঝিয়া সেখানে জাগয়া জমী কিনিয়া, ঘরবাড়ী করিয়া স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুতরাং দেখিতে দেখিতে হুগলীনগর নানাদেশীয় লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বদাই জনকোলাহলে মুখরিত এবং অর্থে ও সম্পদে সর্ব্বপ্রকারেই অশেষ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। দিন দিন হুগলীর সমৃদ্ধির পরিচয় দেশ-বিদেশে যতই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ততই নানা দেশের নানা প্রকার লোক, নানা শ্রেণীর বণিকদল, আসিয়া হুগলী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন হইতেই দেশ-বিদেশের ইতিহাসে হুগলী একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও সুন্দর সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল।

হুগলীনগর তখন যেরূপ ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রেষ্ঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল—গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুর্শিদাবাদও তেমনি হুগলীর অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। সে স্থানও হুগলীর মতই একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী সুন্দর নগর ছিল। সুতরাং সেস্থানও সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বশ্রেণীর বণিকজাতি ও অন্য নানা প্রকারের লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। এইরূপে বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলী ও মুর্শিদাবাদ সেকালে দুই শ্রেষ্ঠ নগর হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই সময়ে ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য যেরূপ হুগলী ও মুর্শিদাবাদে আসিয়া বসতি করিতেন, সেইরূপ আরব এবং পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতেও নানা শ্রেণীর বণিক-জাতি আসিয়া হুগলী ও মুর্শিদাবাদে বসতি করিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, সেইকালে "আগাফজলুল্লা" নামে পারস্যদেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত বণিক এদেশে আগমন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র "হাজি ফয়জুল্লা"ও কারবার করিবার অভিপ্রায়ে এদেশে আসিয়া "হুগলীতে" বাস করিলেন এবং হুগলী ও মুর্শিদাবাদ এই উভয় স্থানেই দোকান খুলিয়া কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় অধ্যাবসায়ের সহিত কারবার করিতে আরম্ভ করিলেন।

যেথানে সততা, যেখানে ন্যায়পারতা, যেখানে কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়, সেইখানেই লক্ষ্মীদেবী সদয় হইয়া থাকেন। হাজি ফয়জুল্লার সাধনাও বিফল হইল না। তিনি যেরূপ সততা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সহিত হুগলী ও মুর্শিদাবাদে দুই জায়গাতেই সমান ভাবে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন, সেরূপ অনেকে পারেন না, সুতরাং ভাগ্য-লক্ষ্মীই বা সদয় না হইবেন কেন?

দেখিতে দেখিতে হাজি ফয়জুল্লার দুই স্থানের কারবারেই খুব উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম আরম্ভ হইল। অল্প কালের মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া একজন প্রধান ধনী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদাই চঞ্চলা—বেশীদিন একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আজ যিনি ধন-কুবের হইয়া হাজার হাজার লোকের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেছেন কাল হয়ত তাঁহাকে একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে

ফেলিয়া, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। আবার আজ যিনি নিতান্ত দরিদ্র, নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি—সংসারে কেহ একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় দুইদিন পরেই তাঁহাকে ধনকুবের হইয়া সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা ভাগ্যবিধাতা হইতে দেখা যায়।

হাজি ফয়জুল্লার ভাগ্যেও কিছুদিন পরে সেইরূপ এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা কেহই জোরের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। আজ বাজারে যে জিনিষের যে দর; কাল হয়ত তাহা দশ গুণ বাড়িয়া দোকানদারগণকে বড়মানুষ করিয়া দিয়া গেল। আশায় আশায় ব্যবসাদারগণ আরও দর বাড়িবার প্রলোভনে সেই দ্রব্য বহুল পরিমাণে কিনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন, কিন্তু পরে সহসা একদিন হয়ত সেই দ্রব্যের বাজারদর আবার এমন কমিয়া গেল—এবং আর মোটেই বাড়িবার সম্ভাবনা রহিল না—যে সেই সব ব্যবসাদারগণই আবার লোকসান দিতে দিতে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সুতরাং বাণিজ্য-ব্যবসায় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ইহাতে বড়মানুষ হইতে যতক্ষণ, আবার ফকির হইয়া পড়িতেও তার চেয়ে বেশী সময় লাগে না।

হাজি ফয়জুল্লাও সেইরূপে, যে দুই স্থানের কারবারে অত্যন্ত ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, আবার সেই কারবারেই, সেই সমস্ত ধন-সম্পত্তি হারাইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িলেন।

সে অবস্থায় আর তাঁহার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া আত্মীয় বন্ধুগণের সমাজে হীন হইয়া বাস করিবার প্রবৃত্তি হইল না। মানুষ যে মাটীতে পড়িয়া যায়, আবার সেই মাটীতে ভর করিয়াই উঠিয়া দাঁড়ায়—ইহা ভাবিয়া তিনি—ভবিষ্যতের আশায়—অতি সামান্য ভাবে কারবার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর হুগলী এবং মুর্শিদাবাদ দুই জায়গাতেই কারবার রাখিতে পারিলেন না। তিনি এখন মুর্শিদা-

বাদের কারবার তুলিয়া দিয়া, হুগলীতেই সামান্য রকম দোকান খুলিয়া বসিলেন এবং সেইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন—বাদশাহ ঔরঙ্গজেব।

"আগা মতাহর" নামে পারস্য দেশের অন্য একজন সম্ভ্রান্ত বণিক বাদশাহের সরকারে কর্ম্ম করিয়া তখন সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেকালে যাঁহারা আপন কর্ম্মদক্ষতা কিম্বা স্বভাবের গুণে কোন রকমে একবার বাদশাহদের সুনজরে পড়িতে পারিতেন, তাঁহাদের আর কোন বিষয়ে কোন প্রকার অভাব থাকিত না। অর্থ, সম্পদ, জায়গীর, জমীদারী, সম্মান, সম্ভ্রম, খেতাব প্রভৃতি সকল বস্তুই বর্ষার বারিধারার মত তাঁহাদের উপরে বর্ষিত হইত এবং অতি শীঘ্রই তাঁহারা দেশের মধ্যে ক্ষমতাবান্ বড় লোক হইয়া লোকসমাজে মান্য গণ্য এবং সম্ভ্রান্ত ওমরাহ হইয়া উঠিতেন। এরূপস্থলে, সম্রাটের প্রিয়পাত্র যিনি তিনি যে অসামান্য বড় লোক হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই পারস্যদেশবাসী বণিক "আগা মতাহর" সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং সংসারে বড় হইতে তাঁহারও আর বিলম্ব ঘটিল না।

"আগা মতাহর" আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে সম্রাটকে পরম সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যশোহর প্রভৃতি বঙ্গদেশের কয়েকটি ভাল ভাল স্থান জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই এ দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বড় লোক হইয়া উঠিলেন।

যিনি, যেখানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া বড়লোক হইলে, তখন তাঁহার কোনও সমৃদ্ধিশালী নগরের বুকের উপর আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। আগা মতাহর সম্রাটের অনুগ্রহে যখন জায়গীরদার হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহারও সেইরূপ ইচ্ছা প্রবল হইল।

হুগলীনগরের তখন খুব নামডাক। যত বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের বাস তখন হুগলীতে। সুতরাং আগা মতাহরেরও হুগলীতে আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া, হুগলীতে জায়গাজমী কিনিয়া ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে তখন "হাজিফয়জুল্লা" এবং "আগা মতাহর" এই দুই জন সম্ভ্রান্ত পারস্য দেশীয় বণিকের হুগলীনগরে প্রথম বসবাস ঘটিল। দুইজনেই সম্ভ্রান্তবংশীয়, দুইজনেই পারস্যদেশবাসী সুতরাং তাঁহাদের দুই ঘরে আলাপ-পরিচয় এবং বন্ধুত্ব জন্মিতে বিলম্ব হইল না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংসারে এমন এক একজন লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদিগকে সংসারে চারিদিক হইতে শত শত স্নেহের বন্ধন আসিয়া বাঁধিয়া ফেলিবার সুযোগ পায় না। তাঁহাদের হয়ত এই বিশাল বিশ্বসংসারে একটি কিম্বা দুইটি ভিন্ন আর অন্য স্নেহের বন্ধন নাই। সুতরাং লোকে তাঁহাকে হয়ত দুঃখী বলিয়া মনে করিতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে লোক মোটেই দুঃখের ধার ধারেন না। যাঁহাদের সংসার-কাননের চারিদিকে শত শত হাসিভরা মুখগুলি রাশি রাশি ফোটা ফুলের মত নিয়তই বেষ্টন করিয়া হাসিতে থাকে, যাঁহাদের চারিদিক হইতে শত শত কোমল বাহু স্নেহের শিকলে বাঁধিয়া সংসারের দুঃখ-জ্বালা ভুলাইয়া দেয়, যাঁহাদের প্রয়োজনের সময়ে সারি সারি প্রিয় বস্তুগুলি চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাঁহারা এই অগাধ গভীর স্নেহের গণ্ডীর ভিতরে দাঁড়াইয়া মনে মনে সুখ ও

সৌভাগ্যের কল্পনা করিতে করিতে ভাবেন যে—এ সংসারে যাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার সামগ্রী বেশী নাই তাঁহারা কি দুঃখী ?

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। সংসারে যাঁহার ভালবাসিবার জিনিষ একটি কি দুইটি ভিন্ন আর নাই, তিনি সেই একটি কি দুইটি মাত্র স্নেহের বস্তুকেই সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া এত বেশী ভালবাসিয়া থাকেন যে, সে ভালবাসার তুলনা হয় না এবং তাহাদের স্নেহে ডুবিয়া এত বেশী সুখী হইয়া থাকেন যে সংসারে তাঁহাদের মত সুখী অতি অল্প লোকই দেখিতে পাওয়া যায়।

(আগা মতাহরেরও তেমনি এই বিশাল জগৎ-সংসারের মধ্যে কেবল একটি মাত্র স্নেহের বন্ধন ছিল,—সেটি, তাঁহার একমাত্র কন্যা-সন্তান, নাম—"মন্নুজান"। এই মন্নুজান ভিন্ন তাঁহার আর সন্তান সন্ততি ছিল না। )

তা না থাকুক, সেজন্য আগা মতাহরের মনে কখনও একটি দিনের জন্যও কোনপ্রকার ক্ষোভ বা দুঃখের উদয় হয় নাই। লোকের উপযুক্ত সন্তান সন্ততি বেশী থাকিলে তাঁহাদের মনে যেরূপ সুখ ও গর্ব্বের উদয় হইয়া থাকে, কেবলমাত্র এই একটি কন্যারত্ন লাভ করিয়াই তিনি মনে মনে সেইরূপ সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

বাস্তবিকপক্ষে সে কন্যাও ছিল একটি অমূল্য রত্ন বিশেষ। তেমন কন্যা লাভ করা অল্প পুণ্যের ফলে ঘটে না। মন্নুজান যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী, আবার তেমনি পিতৃবৎসলা। যে পিতার পুণ্যের ফলে তেমন কন্যা লাভ হয়, তিনি দরিদ্র হইলেও রাজ-রাজেশ্বর, অভাগা হইলেও পরমসৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে।

মন্নুজান "বাপ" বলিতে অজ্ঞান হইতেন, ছায়ার মত সর্ব্বদাই বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিসে তাঁহার পিতা সুখী হইবেন, কিসে তিনি সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিবেন—বাল্যকাল হইতেই এই চেষ্টা

ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ও জীবনের একমাত্র ব্রত। বাপের পায়ে কাঁটাটি ফুটিলে মেয়ের বুকে যেন শেল বিঁধিত, নিজে দাঁতে করিয়া সে কাঁটা তুলিয়া দিতেন। বাপের মুখ একটুখানি মলিন দেখিলে মেয়ের বুক ফাটিয়া যাইত—দশদিক অন্ধকার দেখিতেন। বাপই ছিল এসংসারে মেয়ের ধ্যান, জ্ঞান, প্রার্থনা, কামনা—বাপই ছিল এ সংসারে মেয়ের একমাত্র জগৎপতি জগদীশ্বর।

সুতরাং এমন মেয়ে লাভ করিয়া বাপই বা আপনাকে মহা সুখী ও নিতান্ত সৌভাগ্যবান্ মনে না করিবেন কেন? একদিকে মতাহর যেমন অগাধ ধন-সম্পত্তি এবং মান-সম্ভ্রমের অধীশ্বর, অন্যদিকে আবার তেমনি সেই দুর্লভ কন্যা-রত্ন লাভ করিয়া তিনি অসীম সুখ-সৌভাগ্য উপভোগ করিতেন।

মেয়েও যেমন বাপ-অন্ত-প্রাণ, বাপও তেমনি এক দণ্ড মেয়েকে চক্ষের আড় করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিসে মন্নুজান সুখী হইবে, কিসে মন্নুজান সর্ব্বদাই ফোটফুলটির মত প্রফুল্ল হইয়া থাকিবে, কিসে মন্নুজানের মনে একটি দিনের জন্যও কখন কোনপ্রকার অভাবের উদয় হইবে না, অবিরত সেই চেষ্টা করিতেন।

মতাহরের অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অর্থ এবং স্নেহে যতদূর করিতে পারা যায়, তিনি কন্যার জন্য তাহার কিছুই বাকী রাখিতেন না। এমন কি, এই কন্যাটিকে তিনি এমনই ভালবাসিতেন যে তাহার স্নেহে নিমগ্ন হইয়া তিনি সংসারের আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইতেন না এবং আর কোনদিকে কি অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্যকও বিবেচনা করিতেন না। গাছ এবং লতা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় এবং অবলম্বন করিয়া যেমন বাঁচিয়া থাকে, এই পিতা এবং কন্যা তেমনি পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় এবং অবলম্বন করিয়াই এ সংসারে দিন কাটাইতেছিল।

ইহার ফলে কিন্তু আর একদিকে যে আর এক বিভ্রাট ঘটিবার সূচনা হইতেছিল, তাহা এই স্নেহময় পিতা এবং পিতৃবৎসলা কন্যা একদিনের জন্যও ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারেন নাই।

আগামতাহর সম্রাটের প্রিয়পাত্র, বিপুল ধন-সম্পদ এবং মান-সম্ভ্রমের অধীশ্বর। সুতরাং সংসারের অনেক লোকই মনে মনে বিস্তর আশা লইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। অনেকেই তাঁহাকে হস্তগত করিয়া টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি করিয়া লইবে মনে করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টায় ফিরিত।

বিশেষ এ বিষয়ে সর্ব্বদাই অগ্রগামিনী ছিলেন, মন্নুজানের মাতা—মতাহরের পত্নী। তিনি অতবড় ধনকুবেরের স্ত্রী হইয়া স্বামীর মৃত্যুর পর যে অর্থশূন্য ভিখারিণী হইয়া পড়িবেন—এ ভাবনা সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহার দুইটি কারণ ছিল।

প্রথমতঃ, মুসলমানের আইন অনুসারে, পুত্রসন্তানের মত কন্যা-সন্তানও সমানভাবে পিতার বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। এরূপ-স্থলে স্বামী যদি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে হাত তুলিয়া স্ত্রীকে কিছু দিয়া না যান অথবা মৃত্যুকালে উইল করিয়াও তাহাকে বিষয়ের ভাগ না দেন, তাহা হইলে মন্নুজানই যে মতাহরের সমস্ত বিষয় বিভবের একমাত্র অধিকারিণী হইবে তাহা নিশ্চয়, এবং বিবাহের পর সে যখন স্বামী-গৃহে চলিয়া যাইবে, তখন সেই বিপুল বিষয়-সম্পত্তিও সে লইয়া পর হইয়া যাইবে—তাঁহার নিজের কিছুই থাকিবে না।

এই গেল এক কথা। আর এক কথা এই যে, তখনকার দিনে মুসলমানদের ভিতর বহুবিবাহ করা এবং ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিবার রীতি ছিল, এবং প্রভু ইচ্ছা করিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিতেও পারিতেন। এরূপস্থলে স্বামীর উপর কিম্বা পুত্র-কন্যার উপর অগাধ স্নেহ না জন্মিয়া বরং স্ত্রীলোকদিগের আপনার

স্বার্থের প্রতিই বেশী নজর থাকিত। এরূপ হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। কারণ, পুত্রকন্যা জন্মিবার পরে স্বামী বা প্রভু দূর করিয়া দিলে, তখন তাহাদের আর আশ্রয় বা অবলম্বন থাকিত না, কাজেই তাহারা আবার অন্য ব্যক্তিকে নিকা করিয়া পূর্ব্বের সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিত। এরূপ অবস্থায় যে স্ত্রীলোকদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি স্বভাবতঃই থাকিবে তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। মতাহরের পত্নী মন্নুজানের মাতার প্রকৃতি সেইরূপ ছিল।

কিন্তু হইলে হইবে কি, মতাহর একমাত্র কন্যা মন্নুজান ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি বিশেষ নজর রাখিতেন না। সুতরাং লোকে তাঁহাকে হাত করিয়া যতই নিজেদের স্বার্থসাধনের চেষ্টা করুক না কেন, সে সমুদয়ই ব্যর্থ হইত। মতাহরের পত্নীরও তাহাই হইল।

মতাহর কন্যাকে একটি বড় সোণার পদক গড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে মন্নুজান যেন সেই পদক ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যাহা আছে তাহা লয়। কিন্তু তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, মন্নুজান ততদিন সে কবচ ভাঙ্গিতে পারিবে না।

যথাকালে আগামতাহরের মৃত্যু হইলে, মন্নুজান সেই পদকটি সকলের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া দেখিলেন যে তাহার ভিতরে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে মতাহরের উইল রহিয়াছে। উইলের লেখা পড়িয়া সকলে চমকিত হইল এবং মতাহরের স্ত্রী মন্নুজানের মাতার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সেই উইলে দেখা গেল, যে, মতাহর, অন্য কাহাকেও কিছুমাত্র না দিয়া তাঁহার বিপুল বিষয়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, স্থাবর-অস্থাবর সমস্তই একমাত্র মন্নুজানকে দিয়া গিয়াছেন।

তখন মতাহরের পত্নী নিরাশ হইয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতদিনে তিনি যথার্থই পথের ভিখারিণী হইলেন।

কিন্তু এ অবস্থা তিনি সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মনের ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি তখন সমস্ত পূর্ব্বসম্পর্ক ছেদন করিয়া পুনরায় আবার হাজি ফয়জুল্লাকে বিবাহ করিলেন।

ইংরাজী ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের এক পুত্র-সন্তান জন্মিল। এই পুত্রই মহাপুরুষ—হাজি মহম্মদ মহসীন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদ মহসীন যখন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই কালে এদেশে বিলাসিতার স্রোত প্রবলভাবে বহিতেছিল। বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে পাপের মাত্রাও দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রসমাজে ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার বাড়াইয়া দিয়াছিল। এমন কি, যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাশি রাশি বাঁদী ও ক্রীতদাসী বেষ্টিত হইয়া, সর্ব্বদাই, নৃত্য-গীত, পান-ভোজনে মগ্ন না থাকিতেন, লোকে তাঁহাদিগকে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত না।

সুতরাং সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ঘরে—যাঁহার যেরূপ আয় ও শক্তি, তিনি সেই অনুসারেই সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে ডুবিয়া থাকিতেন। সমাজের এরূপ অবস্থায়, বাল্যকাল হইতেই মহম্মদ মহসীনও যে সেইরূপ হইয়া উঠিবেন তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি বাল্যকাল হইতেই বরং সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিলেন।

মহসীন বাপ-মায়ের আদরের পুত্র। হুগলীতে "আগামতাহরের" বাড়ীর কাছেই তাঁহাদের বাড়ী। এরূপ অবস্থায় মতাহরের বিধবা পত্নী কন্যাকে ফেলিয়া আসিয়া মনের ক্ষেদে যখন হাজি ফয়জুল্লাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রকারে আনন্দ ও শান্তি

দিবার জন্য হাজি ফয়জুল্লাও সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সংসারেও শক্তি ও সাধ্যমত বিলাসের স্রোত নিতান্ত কম বহিত না। সেরূপ অবস্থায় যখন মহসীন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বাপ-মা সেই পুত্রের প্রতিপালনে যে কোনপ্রকার আদর-যত্ন এবং যথাসাধ্য অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মহসীন শৈশব হইতেই নানাবিধ সুখ-বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু বালক যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল যে, সুখ-বিলাসের দিকে তাঁহার মোটেই দৃষ্টি নাই, বরং তাহাতে তিনি বিরক্তবোধ করেন। বালক সর্ব্বদাই আপনার মনে যেন কি ভাবে, নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে, গোলমালের ধারে ঘেঁসিতেও ভয় পায়। নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদের কলরব শুনিলে সেখান হইতে দূরে সরিয়া গিয়া যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে।

এদিকে এমন, কিন্তু ওদিকে আবার ভগবানের স্তোত্রগান শুনিলে আহ্লাদে আটখানা হয়। সুর করিয়া কোরাণ পাঠ করিলে বালক একমনে কান খাড়া করিয়া শুনে, সকলে মিলিয়া একসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে যখন নমাজ পড়ে, তখন তাহা শুনিয়া আনন্দে নাচিতে থাকে, ভিখারীদের মুখে 'গজল্' গান শুনিলে, সেখানে ছুটিয়া গিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে দিন দিন বালক যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সুখ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়া অন্য রকম হইয়া উঠিতে লাগিল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সৌখিন জিনিষ দেখিলে ছুটিয়া লইতে যায়, রঙ্গিন কাপড়-চোপড় পাইলে আহ্লাদে মাতিয়া উঠে, এটা ওটা লইবার জন্য সর্ব্বদাই কত আবদার করে, কিন্তু মহসীনের সবই বিপরীত। তাঁহার মনে কোন দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা নাই—কখনও কোন কিছুর জন্য আবদার করিতে জানেন না,—নিতান্ত সহজ সাদাসিধা

অবস্থাতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। ভাল ভাল কাপড় জামা পরাইয়া দিলেও তাঁহার মনে কোন রকম বেশী আহ্লাদ বা সখের উদয় হয় না, এবং নিতান্ত সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিলেও কোনরকম দুঃখ বা অভাব জানিতে পারেন না। বরং ভাল ভাল কাপড় জামা পরাইয়া দিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন ভিক্ষুক আসিয়া চাহিলে তৎক্ষণাৎ সে সব তাহাকে দান করিয়া আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে হাততালি দিতেছেন।

হাতে খাবার পাইয়া খাইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে যদি কোন গরীবের ছেলেপুলেকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, কিম্বা কেহ তাঁহার খাবারের পানে চাহিয়া রহিয়াছে—দেখিলেন, অমনি সে সমস্তই অম্লানবদনে তাহাকে খাইতে দিলেন। এইরূপ সব কার্য্যে তাঁহার মনে যে আহ্লাদ হয়, তাঁহার মুখখানি যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে—এমন আর কিছুতে হয় না। এইরূপে সেই অদ্ভুত বালক জনক-জননীর ক্রোড়ে শৈশবে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে একটু বড় হইলে, সকলেই আরও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে লেখাপড়ার উপরে—কে জানে, কেমন করিয়া—আপনা-আপনি তাঁহার একটা আন্তরিক টান আসিয়া জন্মিয়াছে।

বালক বই দেখিলেই ছুটিয়া লইতে যায়। একটা সুন্দর পুতুল বা খেলনা এবং একখানা পুস্তক একস্থানে থাকিলে, সে সেই খেল্না বা পুতুলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া, আগে হইতে তাড়াতাড়ি বইখানা তুলিয়া লইয়া দখল করিয়া বসে। তারপরে একবার বই খুলিলে তো আর রক্ষা নাই। সেই নিতান্ত নূতন, নিতান্ত অজানা কালির আঁচড় গুলির ভিতরে সেই অদ্ভুত বালক—যাদুকরের ভেল্কির মত—কে জানে কি মহারহস্যের সন্ধান পায়, সে, আর তাহা ছাড়িতে চায় না। একখানি চক্‌চকে, রঙ্গিন, সুন্দর ছবি হাতে পাইলে বালক

বালিকারা যেমন খেলা-ধূলা ভুলিয়া সেখানি নানারকম করিয়া দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠে, বালকও তেমনি সেই পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া—সেই কালির দাগগুলি একেবারে বিভোর হইয়া দেখিতে থাকে। তখন তাহার আর অন্য কোন কথা মনে থাকে না—খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়।

কোন কারণে বালকের মনে কষ্ট লাগিয়া কচি মুখখানি বিষণ্ণ ভার ভার হইয়া উঠিলে, সম্মুখে একখানি পুস্তক আনিয়া ধরিয়া দিলে, অমনি তৎক্ষণাৎ সে ভাব দূর হইয়া মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠে—কচি ঠোঁট দু'খানিতে মধুর হাসির ঢেউ খেলিতে থাকে। একখানা বই হাতে দিয়া সারাদিন বসাইয়া রাখিলেও, সে আর সেখান হইতে নড়িতে চায় না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনগণ বালককে আপনাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন কিছু করাইতে চাহিলে, একখানা বই হাতে দিয়া, সে কাজ করাইয়া লইতে পারেন।

তাহা ছাড়া বালক কান্না কেমন জানে না—চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারে না। মনে ব্যথা লাগিলে কেবল মাত্র মুখখানি ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যেখানে ছেলের দল দৌড়াদৌড়ি, চেঁচাচেঁচি করিয়া খেলা করিতেছে, বালক সেখান হইতে দূরে সরিয়া যায়। যেখানে তাহারা মারামারি হুড়াহুড়ি করিতেছে দূর হইতে দেখিয়া তফাৎ হইতেই সরিয়া পড়ে। যেখানে তাহারা উচ্চ কলরবে হাট বসাইয়াছে—ভয়ে সে ধারের ছায়াও মাড়ায় না। এইজন্য সে কোন বালকের সঙ্গে মিশিতে পারে না, অন্য কোন বালকও তাহার কাছে আসিতে চাহে না। তবুও তাহাতে বালকের কিছুমাত্র কষ্ট বা অভাব বোধ হয় না, সে আপনার ভাবেই আপনি মগ্ন হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইয়া দেয়।

তা বলিয়া যে কারও সঙ্গে শত্রুতা, কি কারও উপর রাগ

কি ঘৃণা—তাও নাই। অন্য বালকদের সঙ্গে দেখা হইবামাত্রেই এমন সরল, এমন মধুর ভাবের প্রাণ-খোলা একটু হাসি সেই কচি ঠোঁট দু'খানি ভরিয়া উছলিয়া উঠে যে অন্য বালকেরা তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়—সাধিয়া সাধিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ও ভাব করিতে আসে।

শৈশব হইতেই সেই সকল অস্বাভাবিক, অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়া কত লোকে উপহাস করে, কত লোকে সুখ্যাতি করে, আবার কত লোকে অন্য কত রকম কথা বলে যে, সে সব শুনিয়া শুনিয়া বাপ মায়ের প্রাণ কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, কখনও দুঃখে কাঁদিয়া উঠে, আবার কখনও বা ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

সেইজন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহাদের মহসীনও আর পাঁচজনের ছেলের মত হয়। এই চেষ্টাতে তাঁহারা মহসীনকে সর্ব্বদাই আমোদ-প্রমোদ ভোগ, বিলাসের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন। সর্ব্বদাই ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়া সর্ব্বদাই নানারকম খেলার জিনিষ দিয়া, সর্ব্বদাই অশেষ প্রকারের রসনা-তৃপ্তিকর ভাল ভাল খাবার জিনিষ খাইতে দিয়া উহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হায়! সে সমস্তই ভস্মে ঘৃত ঢালিবার মত হইয়া পড়ে। বালকের গাম্ভীর্য্য ঘুচে না—চঞ্চলতা আসে না—মনে সখের উদয় হয় না।

এই জন্য লোকেও আপন আপন মনের মত মহসীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে—নানা কথা বলিতে ছাড়ে না, বাপ-মায়ের মনের ভয়-ভাবনাও ঘুচে না। তাঁহারা অনবরত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, এবং দেবতাদের কাছে সিন্নি মানসিক করেন যে, মহসীন যেন মানুষের মত মানুষ হয়।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এইরূপে ক্রমে উপযুক্ত বয়স হইলে মহসীনের বিদ্যাশিক্ষার সময় আসিল। এখনকার মত এদেশে তখনকার কালে হিন্দু সন্তানগণের লেখাপড়া শিখিবার জন্য এরূপ ইস্কুল, পাঠশালা এবং মুসলমানগণের বিদ্যাভ্যাসের জন্য এরূপ মক্‌তব্ বা মাদ্রাসা প্রভৃতি ছিল না। কাজেই ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভার পড়িত শিক্ষিত মৌলবী বা সেই প্রকারের ব্যক্তিগণের উপরে। মহসীনকেও লেখাপড়া শিখাইবার ভার পড়িল সেই শ্রেণীর এক ব্যক্তির উপরে—তাঁহার নাম "সিরাজী"।

এই "সিরাজী" সেই সময়ের একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আরবী ও পারসী ভাষায় তাঁহার যেমন অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল—সাংসারিক সকল বিষয়ে তেমনি তাঁহার বহুদর্শিতাও যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সকল বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এদিকে শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন, ওদিকে আবার তাঁহার চরিত্রও তেমনি পরম পবিত্র ও মহৎ ছিল। যে লোক একবার তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তখনকার মহাবিলাসী সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সতত থাকিয়াও সিরাজীর চরিত্র কলুষিত হইতে পারে নাই। তিনি অর্থ, সম্পত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-সম্পদকে অতিশয় তুচ্ছ ভাবিতেন, এবং যাহাতে লোকের উপকার হয় সেইরূপ কার্য্যে সর্ব্বদাই জীবন-পাত করিতেন, সেই জন্য অনেকে তাঁহাকে সাধু দরবেশ ভাবিয়া সেই প্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে বিরত হইত না। আগা মতাহরের

প্রাণ-সমা কন্যা মন্নুজানও বাল্যকালে এই সাধু, পণ্ডিত সিরাজীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

সিরাজীর নিকট বাল্যকাল হইতেই শিক্ষালাভের ফলে মহসীন যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই দিন দিন তাঁহার স্বাভাবিক লেখাপড়া শিখিবার প্রবৃত্তি আরও বাড়িতে লাগিল এবং শিক্ষকের মত নিজেও যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে মহাজ্ঞানবান হইতে পারেন, সেই ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

সিরাজী আপনার শিষ্য ও ছাত্রের কাছে সর্ব্বদাই তাঁহার নিজের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতেন। নানা দেশ-বিদেশের নানা প্রকার গল্প করিতেন। সেই সব গল্প শুনিয়া শুনিয়া মহসীনের মনে সেই বাল্যকাল হইতেই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

শুধু তাহাই নহে, সিরাজীর শিক্ষাদান ও সঙ্গলাভের ফলে তাঁহার চরিত্রের এবং অন্তরের মহৎগুণ সকলও ছাত্রের চরিত্রে দিন দিন ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। মহসীন শিক্ষকের মত আরবী ও পারসী উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার জন্য যেমন লালায়িত হইয়া পড়িলেন, তেমনি তাঁহার সাংসারিক ভোগ-সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়িতে লাগিল, ধন-সম্পদের উপর বিরাগ জন্মিতে লাগিল—পরোপকার করিবার বাসনা প্রবল হইতে লাগিল এবং ভগবানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিতে আরম্ভ হইল। এইরূপে সুশিক্ষকের হাতে পড়িয়া মহসীনের ভবিষ্যৎ জীবন সেই বাল্যকাল হইতেই উজ্জ্বল উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

যথাকালে সিরাজীর নিকট শিক্ষা শেষ হইলে, মহসীন মুর্শিদাবাদের মক্তবে অধ্যয়ন করিতে গেলেন। এই মুর্শিদাবাদের মক্তবই ছিল সে সময়ে এদেশের মুসলমান ছাত্রগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষ বিদ্যাশিক্ষার স্থান। তখনকার কালে যে সকল মুসলমান ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা লাভ

করিয়া পণ্ডিত হইতেন—তাঁহাদিগকে এই বিদ্যালয়ের শেষ পড়া পড়িয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইত। মহম্মদ মহসীনও সেই মুর্শিদাবাদের মকৃতবে শেষ পড়া সম্পূর্ণ করিয়া এখানকার লেখাপড়া সমাধা করিলেন।

লেখাপড়া শেষ করার পরে লোকের সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় এবং সকলে তাহাই করিয়া থাকে। কিন্তু মহসীনের তাহার বিপরীত হইল। এখানকার পাঠ সম্পূর্ণ করিয়াও তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। মুর্শিদাবাদের মকৃতবে পড়িয়া তিনি যখন তখনকার কালের উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেন, তখন আরও বেশী পড়িবার, জানিবার ও জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল।

বিশেষতঃ আরবী ও পারসী উত্তমরূপে শিখিবার জন্য তাঁহার একান্ত অনুরাগ এবং দেশভ্রমণ করিবার ইচ্ছাও অত্যন্ত প্রবল। তিনি শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে দেশভ্রমণ না করিলে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় না—সুতরাং পড়াশুনারও শেষ হয় না। অতএব তিনি এক্ষণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মহসীন উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বিদেশে যাইতে চাহেন শুনিয়া একদিকে পিতামাতার মনে যেমন অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল অন্যদিকে তাঁহার ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তাঁহারা তেমনি কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পণ্ডিতবর সিরাজী যখন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া ভরসা দিলেন, তখন তাঁহারা আর পুত্রের মহৎ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে বাধা দিতে পারিলেন না—বরং সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তখন মহসীন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

এইরূপে আবর ও পারস্য দেশে গিয়া মহসীন আরবী ও পারসী দুই ভাষাতেই পরম পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করিলেন। এই দুই কঠিন ভাষাতেই তাঁহার এরূপ অগাধ ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞান জন্মিল যে, মহাপণ্ডিত

বলিয়া সেই দুই ভাষার মাতৃস্থানেই তাঁহার অত্যন্ত খ্যাতি ও যশ প্রচার হইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া সেই মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, বছর কতক ধরিয়া দেশে-বিদেশে ক্রমাগতঃ পণ্ডিত, মৌলবী ও সাধু দরবেশ-গণের সহবাসে থাকিয়া থাকিয়া মহম্মদ মহসীন সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আদর্শ-চরিত্র হইয়া উঠিলেন।)

বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন যে সংসারের ভোগ-বিলাসে সুখ নাই, কারণ তাহাতে দিন দিন কামনা আরও বাড়িতেই থাকে, সে কামনা জীবনে কাহারও কখনও মিটে না এবং মিটিতেও পারে না। সুতরাং মনের ভিতরে সর্ব্বদাই কামনার আগুন জ্বলিতে থাকিলে লোকে সুখী হইবে কেমন করিয়া?

সংসারে যদি যথার্থই সুখ কিছু থাকে তবে তাহা—মনের শান্তি ও তৃপ্তি। এই মনের শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে হইলে শরীরের স্বাস্থ্য বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু সংসারের ভোগ-বিলাসে মত্ত হইলে সেই অমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া শরীরে নানাবিধ ব্যাধি প্রবেশ করে এবং তাহাতে শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া দেয়। অতএব মনের শান্তি ও তৃপ্তি পাইতে হইলে শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং শরীর নষ্ট করিবার যাহা প্রধান হেতু সেই ভোগ-বিলাসকে মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে।

ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি তো (ভোগ-বিলাসের কামনা মন হইতে একেবারেই দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া নানাবিধ ব্যায়ামের চর্চ্চায় শরীরকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিয়াছিলেন।) তিনি লেখাপড়ায় যেমন পণ্ডিত, চরিত্রেও তেমনি সাধু, আবার শারীরিক স্বাস্থ্যেও তেমনি অসামান্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং সুস্থ শরীরের ভিতরে থাকিয়া মনও সুস্থ, সবল, শান্ত ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে লেখাপড়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মহসীন একজন

ভাল কুস্তীগীর পালোয়ান, উত্তম অশ্বারোহী, বিলক্ষণ সন্তরণপটু, সুদক্ষ তরবারিক্রীড়ক এবং অসাধারণ পরিশ্রম-নিপুণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের শক্তি এবং জ্ঞানবুদ্ধি যেমন আশাতীত প্রকারে বর্দ্ধিত হইল, সর্ব্বপ্রকারে শারীরিক শক্তি এবং স্বাস্থ্যও তেমনি বাড়িল। সর্ব্ব বিষয়েই তিনি একজন প্রকৃত বীর এবং পুরুষের যোগ্য পুরুষ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এরূপ বীরের কাছে কি কখনও বিলাসিতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা হীনতা প্রভৃতি ঘেঁসিতে পারে? কাজেই দেখিতে দেখিতে মহম্মদ মহসীন সংসারে একজন অদ্বিতীয় আদর্শপুরুষ হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে আরব ও পারস্য দেশে বাস করিয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার লোকের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া লইয়া মহসীন ক্রমে ক্রমে আরও অগ্রসর হইয়া তুরস্ক ও মিশরদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে গেলেন। তুরস্ক ও মিশরদেশে কিছুকাল কাটাইয়া তথাকার লোকের ভাষা, পাণ্ডিত্য, সাংসারিক রীতি-নীতি এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় থাকিতে পারে, সে সকল বিষয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, শেষে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াও কয়েক বৎসর ধরিয়া এস্থান হইতে ওস্থান, ওস্থান হইতে সেস্থান ঘুরিয়া নানাদেশ, নানাদৃশ্য, নানাপ্রকারের লোক জন দেখিয়া দেখিয়া নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে নানা ভাষায় জ্ঞানলাভ ও নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে শিখিতে পৃথিবীর সর্ব্ববিষয়ে যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিতে লাগিল, সংসারের সকল প্রকার কার্য্যেই যেরূপ সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চরিত্রও তেমনি মহৎ, উদার, পরদুঃখকাতর, ও পবিত্র হইয়া উঠিল।

এইরূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে তাঁহার সংসারে এক ঘটনা ঘটিল। তাহাতে তাঁহাকে আর বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার অবসর দিল না। এই খানেই তাঁহার দেশভ্রমণ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সংসার লইয়া বসিতে হইল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগামতাহরের কন্যা মন্নুজান এবং হাজি ফয়জুল্লার পুত্র মহম্মদ মহসীন দুই বিভিন্ন পিতার সন্তান হইলেও, এক মাতৃগর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভগবানের বিধান অনুসারে এই দুইটি ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্বাভাবিক স্নেহ, ভালবাসা এবং আন্তরিক টান যাইবে কোথা ?

মহসীন জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই রাজরাণীর মত ঐশ্চর্য্যশালিনী মন্নুজান সেই ছোট ভাইটিকে আপনার প্রাণের মত ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। ঐশ্বর্য্যশালিনী কন্যার প্রতি সেই সকল ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত মাতার মনে মনে হয়ত একটু বিরাগ থাকিলেও থাকিতে পারিত, কিন্তু স্নেহময়ী মন্নুজানের মনে সর্ব্বদাই স্নেহ-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত না। বিশেষ এই ছোট ভাইটিকে পাইয়া তিনি যেন একটি অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছেন এমনি আদর যত্নেই তাহাকে কোলে করিতেন এবং নাড়াচাড়া করিতেন।

মহসীনও শৈশব হইতে সে ভালবাসা এবং আদর-যত্ন বুঝিতে পারিতেন এবং দিন দিন যতই বড় হইতে লাগিলেন, স্নেহময়ী দিদির প্রতি তাঁহারও তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রাণের টান দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে এই দুটি ভাই বোন যেন পরস্পরের

প্রতি পরস্পরের স্নেহ-ভালবাসায় এবং আদর-যত্নে সংসারে আদর্শ স্থল হইয়া উঠিলেন। মন্নুজান মহসীনের চেয়ে বয়সে আট বছরের বড়, সুতরাং মহসীন দিদির চক্ষের মণির মত আদরের ধন হইয়া উঠিলেন।

মন্নুজানও ভ্রাতা মহসীনের মত সেই পণ্ডিতবর সিরাজীর নিকটে বাল্যকালে বিদ্যা এবং অন্যান্য সকল সাংসারিক বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং দান-ধ্যান প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্ম্মে সর্ব্বদাই তাঁহার আসক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িত। সুতরাং রূপে-গুণে এবং ধন-সম্পদে সকল বিষয়েই মন্নুজান আদর্শ রমণী-রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এরূপ স্ত্রী লাভ করা অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। মন্নুজানকে বিবাহ করিবার জন্য বহু ব্যক্তি পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে সকল ব্যক্তির মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিলেন না। এই কারণে নিরাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল।

ইহার পূর্ব্বে মন্নুজানের আরও একদল শত্রু হইয়াছিল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় মন্নুজানের উপর যখন মতাহরের বিপুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকার আসিল, তখন অনেকেই তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া নিজ নিজ স্বার্থ-সাধন করিয়া লইবার জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মন্নুজান নিঃসহায় স্ত্রীলোক হইয়াও এমন সুন্দররূপে সেই সকল বিষয়-বিভবের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন যে দুষ্টগণের কোন অভিসন্ধিই সিদ্ধ হইল না।

কিন্তু তিনি যখন বিবাহার্থী যুবকগণকে নিরাশ করিয়া একে একে সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিলেন তখন তাহারা সেই সকল দুষ্টগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, দল পাকাইয়া একযোগে মন্নুজানের যে শত্রুতা

সাধিতে লাগিল এবং অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল তাহা ভয়ানক। এমন কি, এক সময়ে সুযোগ বুঝিয়া তাহারা মন্নুজানের প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তখন মহসীনের পাঠ্যাবস্থা—গৃহে থাকিয়া সিরাজীর নিকটে পড়িতেন। ঘটনাক্রমে তিনি দুষ্টগণের এই চক্রান্ত টের পাইলেন। তাঁহার ভগ্নীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা, সুতরাং তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে তাহাদের সকল ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া, তখনি গিয়া দিদিকে সকল কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

এই উপায়ে দুষ্টগণের চক্রান্ত বিফল হইয়া গেল—মন্নুজানেরও প্রাণরক্ষা হইল। তদবধি ভ্রাতার প্রতি তাঁহার স্নেহ-ভালবাসা আরও শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল।

মন্নুজান যে ইচ্ছা করিলে ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিতেন না এমন নয়। তিনি তখন স্বাধীন—অগাধ বিষয়ের মালিক, তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবার কেহ ছিল না। কিন্তু পিতৃবৎসলা কন্যা মৃত পিতার আদেশ পালন করিবার জন্যই তাহা করেন নাই।

আগামতাহরের ইচ্ছা ও আদেশ ছিল যে পারস্য দেশবাসী তাঁহার ভাগিনেয় সলাউদ্দীনের সঙ্গে মন্নুজানের বিবাহ হইবে। মরিবার সময়েও এ কথা বলিয়া যাইতে ভুলেন নাই। এই জন্যই পিতৃবৎসলা কন্যা যে দিন হইতে পিতার মনের এই অভিলাষ জানিতে পারিয়াছিলেন সেই দিন হইতেই চক্ষে না দেখিলেও, সলাউদ্দীনকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কেবলমাত্র এই কারণের জন্যই মন্নুজান অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।

ক্রমে যথাসময়ে মন্নুজানের বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে পারস্যদেশে সলাউদ্দীনের কাছে তাঁহার পরলোকগত মাতুলের ইচ্ছা

ও আদেশ জানাইবার জন্য লোকে প্রেরিত হইল। সেখানে সকলেই শুনিয়াছিল যে আগামতাহর ভারতবর্ষের বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া যথেষ্ট ধন-সম্পদ এবং ভূসম্পত্তি প্রভৃতি করিয়া বঙ্গদেশে মহাসম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার যে একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর অন্য সন্তানাদি নাই এবং সেই কন্যাই যে মৃত পিতার পরিত্যক্ত বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছেন এ কথাও কাহারও অজ্ঞাত ছিল না।

সুতরাং মন্নুজানের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে সলাউদ্দীন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পারস্যদেশ হইতে বঙ্গদেশের হুগলীতে আসিলেন এবং মন্নুজানের পানি গ্রহণ করিলেন।

যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে আগামতাহরের বিস্তর জমী জমা, তালুক মুলুক ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যা মন্নুজান সেই সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন এবং সাংসারিক সকল বিষয়ে সুশিক্ষা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে এতদিন একাই সেই বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সলাউদ্দীন সেই সকলের অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে মহম্মদ মহসীন শিক্ষালাভের জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া আরব ও পারস্যদেশে চলিয়াগিয়াছিলেন। এবং তথাকার শিক্ষা শেষ করিয়া তুরস্ক, মিশর, তাতার প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখনকার কালে, এখনকার কালের মত এরূপ, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতি ছিল না, সুতরাং মহসীনের সংবাদ ক্বচিৎ, কালেভদ্রে দেশে আসিয়া পঁহুছিত। তিনি যে কতদিন কোন্ দেশে থাকিয়া আবার কোথায় যাইতেছেন, কতদিন কোথায় থাকিতেছেন, সে সকল সংবাদ তাঁহার বাড়ীর লোক সঠিক জানিতে পারিত না, সুতরাং তাহা মন্নুজানও জানিতেন না। তবুও স্নেহময়ী দিদি সর্ব্বদা

ছোট ভাইটির সংবাদ জানিবার জন্য প্রাণপণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার ত্রুটি করিতেন না।

(মন্নুজান পিতৃস্নেহ এবং বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-ঐশ্বর্য্যে যেরূপ ভাগ্যবতী ছিলেন দাম্পত্য-জীবনে সেরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিবাহের বছর কতক পরেই ভাগ্যদোষে তিনি বিধবা হইলেন। এইরূপে অল্প বয়সে সলাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে, সেই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার আবার মন্নুজানের স্কন্ধেই আসিয়া চাপিয়া পড়িল।)

কিন্তু এবারে সে সকলের উপর তাঁহার আর তেমন স্পৃহা বা মন ছিল না। প্রথমতঃ, স্বামী-শোকে তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়া ফেলিল, সে অবস্থায় বিষয়-সম্পত্তি, ধন-ঐশ্বর্য্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে তাঁহার আর ভাল লাগিল না। দ্বিতীয়তঃ, পিতৃহীন হওয়ার পর কঠোর পরিশ্রমে তিনি সে সকল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বিবাহের পর স্বামীর উপর সকল ভার ছাড়িয়া দিয়া একটু বিশ্রাম পাইয়া যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই সকল যখন আবার আসিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িল তখন তিনি বড়ই বিরক্তি বোধ করিলেন।

অথচ না করিলেই বা উপায় কি? এদিকে দিন দিন তাঁহার বয়সও বাড়িয়া বার্দ্ধক্যের দিকে চলিয়াছিল, তিনি আর কতকাল সে কঠোর পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারিবেন? তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, ভ্রাতা মহসীনের উপরে সেই সব ভার চাপাইয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।

কিন্তু মহসীন যে তখন কোথায় কি করিতেছিলেন তাহা তাঁহার কিছুই জানিবার উপায় ছিল না। তবু তিনি ভ্রাতার উদ্দেশে চারিদিকে নানাস্থানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল ফলিল না। মহসীন যেরূপ অজ্ঞাতবাসে কাটাইতেছিলেন

সেইরূপই রহিলেন, সুতরাং মন্নুজানের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না।

এইরূপে আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল। মন্নুজান, ক্রমে বৃদ্ধা হইয়া পড়িলেন, দেহের শক্তি ও মনের বল সমস্তই কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন আর যে পূর্ব্বেকার মত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিষয়-সম্পত্তি দেখা শুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন না তাহা বুঝিলেন। সুতরাং ভ্রাতার উদ্দেশ করিবার জন্য ক্রমাগত নানাস্থানে পত্রাদি লিখিতে এবং লোকজন পাঠাইতে লাগিলেন। তাহার ফলে, এবার অনেক কষ্টে তাঁহার সন্ধান মিলিল।

মহসীন ভগ্নীর পত্র পাইলেন এবং তাঁহার মনের ভাবও বুঝিলেন। কিন্তু নানা দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানলাভ করিয়া বিষয়-সম্পত্তির উপরে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ জন্মিয়াছিল। অনবরত সাধুসঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সুতরাং তিনি আর বিষয়-সম্পদের ভিতরে জড়িত হইতে চাহিলেন না এবং এইজন্যই ভগ্নীর পত্র পাইয়াও তিনি প্রথমতঃ দেশে ফিরিলেন না।

এদিকে মন্নুজানের শরীরও দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি যে আর বেশীদিন বাঁচিবেন না তাহা বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

তিনি ভ্রাতাকে আপনার শরীরের অবস্থা জানাইয়া দেশে ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহসীন স্নেহময়ী ভগ্নীর বারম্বার সেই কাতর অনুরোধ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, গৃহে ফিরিতে সম্মত হইলেন।

বিদেশে মহসীনের অনেকগুলি ধর্ম্ম-বন্ধু জুটিয়াছিল। অবশেষে,

ভগ্নীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে তাঁহাদের মধ্যে "রজবআলি খাঁ" ও "সাকের আলি খাঁ" নামক দুইজন ধর্ম্মবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া মহসীন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন মন্নুজান ভ্রাতা মহসীনকে তাঁহার সমস্ত বিষয়-বিভবের উত্তরাধিকার দান করিয়া ইংরাজী ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

(সংসারে স্পৃহাশূন্য, বিষয়-সম্পদ, ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতি ঘোরতর উদাসীন মহম্মদ মহসীন ভগবানের ইচ্ছায় অতুল সম্পদের অধিকারী হইলেন। সেই সময়ে এই সকল সম্পত্তির আয় পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশী।)

একজন উদাসীন ফকির যে বিনা ক্লেশে, বিনা চেষ্টায়, বিনা উপার্জ্জনে এরূপ ধন-কুবেরের যথাসর্ব্বস্বের মালিক হইয়া উঠিলেন— ইহা অনেকের প্রাণেই সহ্য হইল না। অনেকেই এ ব্যাপারে মহসীনের উপরে অকারণে বিরক্ত হইয়া মনে মনে তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিল এবং কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতেও ছাড়িল না।

"বান্দা আলি খাঁ" নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া কহিল—"এ সব কাহার বিষয়-সম্পত্তি আপনি জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়াছেন ?"

সকলে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহসীন মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার লাভ কি ? তখন সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধে চক্ষু লাল করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিল—

"জানেন, এ সকলই আমার ? আমার মাতা মৃত মন্নুজান বিবি আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির আমিই একমাত্র আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী। এক্ষণে এ সব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন কি না ? সহজে না দিলে আমি রাজদ্বারে নালিশ করিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

শুনিয়া সকলেই অবাক্! মন্নুজানের এমন কোন বিষয় বা এমন কোন গোপনীয় কথা ছিল না, যাহা মহসীন জানিতেন না। স্নেহের ভাইটিকে দিদি তাঁহার সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং যদি তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেন, তাহাও মহসীনকে বলিয়া যাইতেন এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেও ভুলিতেন না। সুতরাং মহসীন বুঝিলেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও ধর্ম্মবন্ধুগণও বুঝিল যে—এ ব্যক্তি ঘোরতর জুয়াচোর।

বিষয়-সম্পদের উপরে মহসীনের কোন প্রকার আকর্ষণ নাই। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ফকির হইয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এখনও সেই ভাবেই কাটাইতেছেন। অতুল বৈভব পাইয়াও তাহার এক কপর্দ্দক নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। সুতরাং তিনি অনায়াসেই সে সমস্তই ওই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহার সম্পত্তি তিনি যখন মৃত্যুকালে একমাত্র তাঁহার উপরেই বিশ্বাস করিয়া সমস্ত অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি যদি তাহা উপযুক্ত কার্য্যে সদ্ব্যয় না করিয়া একজন জুয়াচোরকে ধরিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য করা হইবে। সুতরাং তিনি তাহা করিলেন না।

"বান্দাআলী খাঁ"ও সহজ লোক নহে, বিশেষ তাহার পৃষ্ঠবল যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সে ব্যক্তিও সহজে ছাড়িল না, মহসীনের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়া নালিশ করিল। সুতরাং মহসীন বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া আত্ম-সমর্থন করিবার জন্য আদালতে যথারীতি লড়িতে হইল। এই ব্যাপারে সংসারের উপরে তাঁহার অশ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। মোকদ্দমা অনেক দিন ধরিয়া চলিল, শেষে ধর্ম্মেরই জয় হইল। মহসীন মোকদ্দমায় জিতিয়া—মন্নুজানের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, স্থাবর-অস্থাবরের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া আদালতে সাব্যস্ত হইলেন। তখন শত্রুপক্ষ একেবারে নিরাশ হইয়া পলাইল, আর অন্যকেহ সেই বিষয়-সম্পত্তির দাবী করিতে সাহসী হইল না। এইরূপে ভগবানের ইচ্ছায় সংসার-ধর্ম্মে বিরাগী, ফকির মহসীন ধন-কুবের হইয়া পড়িলেন।

স্ত্রীলোকের প্রতি মহসীনের কোন কালেই কোন প্রকার আসক্তি ছিল না। বিশেষতঃ সেই কালের উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সমাজের বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নানা দোষ দেখিয়া তিনি মনে মনে সংসার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর যখন দুষ্টগণের ষড়যন্ত্রে তাঁহার স্নেহময়ী হিতৈষিণী ভগ্নী মন্নুজানের জীবন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন হইতে সংসারের উপরে তিনি হাড়ে হাড়ে বিরক্ত হইয়া একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার ইচ্ছাও কখনও মহসীনের মনে স্থান পায় নাই।

এক্ষণে সেই এক দায় উপস্থিত হইল। তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজনগণ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, বন্ধুবান্ধবেরা বুঝাইতে আরম্ভ করিল, কত লোক কন্যা দিবার জন্য নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিল। তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, দেশ দেশান্তরে নিরন্তর ভ্রমণ এবং সাধুসঙ্গে দিন যাপন করিয়া তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের যে মধুর আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে তিনি সেই পথই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিয়াছিলেন। সে পথ ছাড়িয়া আর অন্য পথে

আসিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি সকলকে মিষ্টভাষায় নানা প্রকারে বুঝাইয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিষয়েই আসক্তিশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে, সংসারে বাস করিতে লাগিলেন। দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণকালে তিনি যেমন ফকির—যেমন উদাসীন ছিলেন, গৃহে বাস করিয়াও তিনি তেমনই রহিলেন। সংসারের কোন প্রলোভন কি কোন আকর্ষণই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না।

কিন্তু সংসার কার্য্যস্থল, পৃথিবীতে সকলেই কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছে। সকলকেই কার্য্য করিতে হইবে, নচেৎ ধর্ম্মহানি হয়। তাই মহসীন নিজে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়াও কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন।

পৃথিবী যেমন বড়—সংসারে কর্ম্মও তেমনি অনন্ত। লোকে আপন আপন সংসারের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়াই বিশ্রামলাভের জন্য আকুল হইয়া পড়ে, ভাবে যে—'খাটিয়া খাটিয়া মরিয়া গেলাম।' কিন্তু মহসীনের সেরূপ হইল না। তিনি বিবাহ করিয়া যখন আপনার ক্ষুদ্র-সংসার পাতিয়া বসিলেন না—আপনার সাংসারিক কোনপ্রকার স্বার্থেরই বন্ধন রহিল না, অথচ সংসার ছাড়িয়াও ফকির হইয়া বাহির হইলেন না, তখন সমস্ত বিশ্বসংসার আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সকলেই তাঁহাকে পরমাত্মীয় বান্ধব ভাবিয়া আপনাদিগের শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণার বোঝা তাঁহার ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিল। মহসীনও তাহা আনন্দিত মনে বহন করিলেন। সুতরাং তাঁহার আর কার্য্যের অন্ত রহিল না এবং বিশ্রামেরও অবসর রহিল না।

রোগী রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে,—মহসীন সেখানে ঔষধ, পথ্য এবং সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছেন। শোক-কাতর ব্যক্তি বুক-ফাটা ব্যথায় ক্রন্দন করিতেছে—মহসীন

সেখানে জ্ঞানের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া মধুর বচনে তাহাদের প্রচণ্ড শোকে শান্তিবারি ঢালিয়া দিতেছেন। দুঃখে জরজর হইয়া, দারুণ নিরাশায়, যেখানে লোকে অকাল মৃত্যুকে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিতেছে—মহসীন সেখানে দেবদূত রূপে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া দিয়া আশার আলো জ্বালাইয়া দিতেছেন। এইরূপে, যখন যেখানে যাহার যে কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে—মহসীন কোনও না কোনও বেশে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার যথাবিহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন।

শুধুই কি তাই? মহসীনের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি প্রতিদিন যথানিয়মে কোরাণের ভাল ভাল শ্লোক অনেকগুলি করিয়া নিজহস্তে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং এইরূপ অনেকগুলি কাগজ লিখিয়া সে সকল ভিক্ষুকগণকে বিলাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা সেই সকল কাগজ লোকের বাড়ী বাড়ী বেচিয়া—ভিক্ষার অপেক্ষা ঢের বেশী উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এইরূপে ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি কমিয়া গেল।

এ সকল ছাড়া মহসীনের আর এক অদ্ভুত কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতিদিন রাত্রে যথানিয়মে তিনি নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনের ধারণা ছিল যে, সংসারে আমোদ-প্রমোদের উচ্ছ্বাস যতই বহিতে থাকুক না কেন—এখানে দুঃখ কষ্টের অন্ত নাই এবং তাহার অধিকাংশই যে কোথায় কি ভাবে ঘটিতেছে, তাহা সর্ব্বদা লোকের নজর পড়ে না। সেইজন্য তিনি প্রতিদিন রাত্রিকালে পথে পথে—দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া লোকের অবস্থা জানিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমত তাহার প্রতিকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন ঐরূপ নিশাভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি এক বৃদ্ধার

নীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা দরিদ্র, কিন্তু তাহার পুত্রকন্যা অনেকগুলি। উহাদের প্রতিপালন করিবার সাধ্য বৃদ্ধার ছিল না এবং অন্য উপায়ও ছিল না। বালকবালিকাগণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছিল এবং তাহাদের নিরুপায় জননী নিদারুণ দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছিল।

এ দৃশ্য দেখিয়া মহসীনের করুণহৃদয় গলিয়া গেল। তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্রও সেখানে বিলম্ব না করিয়া এবং কোন কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সেই দণ্ডে আপনি গিয়া সকলের জন্য খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিলেন এবং সেই দিন হইতে তাহাদের সকলের নিত্য প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

আর একদিন রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কুটীর দ্বারে অসিয়া দেখিলেন যে গৃহস্বামী অন্ধ। সে যে যথারীতি উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবে তাহার সে ক্ষমতা নাই। এইজন্য তাহার স্ত্রী অত্যন্ত রাগিয়া স্বামীকে প্রহার করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া, সেই দণ্ডেই মহসীন গৃহের জানালা দিয়া কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা ঘরের ভিতরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। টাকার শব্দে উভয়েই চমকিয়া উঠিল এবং দেখিয়াই অন্ধের স্ত্রী মহা আহ্লাদে সে সকল কুড়াইয়া লইল। মহসীন ততক্ষণে সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর তিনি তাহাদের ভবিষ্যতের বাঁধা বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও ত্রুটি করিলেন না।

এইরূপে প্রতিদিন মহসীন যে কত দরিদ্র লোকের কত রকমে কত উপকার করিতে লাগিলেন, তাহার সীমা-সংখ্যা রহিল না। হিন্দু-মুসলমান ভেদ রহিল না, ইতর-ভদ্র ভেদ রহিল না—যেখানে দরিদ্র সেইখানেই মহসীন নানারূপে মুক্তহস্তে কল্পতরু হইয়া দান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি এ সকল দানের কার্য্য ঘুনাক্ষরেও কাহাকেও জানিতে দিতেন না। এমন কি, তাঁহার ডান হাত কি দান করিতেছে তাহা বাঁ হাত পর্য্যন্ত জানিতে পারিত না—এমনি ভাবে নিজে লুক্কায়িত থাকিয়া দান করিতেন। কিন্তু ভগবানের এমনি মহিমা যে সাধুপুরুষের সেই মহৎকার্য্য সংসারে কাহারও কাছে চাপা থাকিল না। ধর্ম্ম নিজে ঢাক বাজাইয়া ধার্ম্মিককে লোকসমাজে পরিচিত করিয়া দিলেন।

মহসীন যে হঠাৎ লোকের দুঃখ দেখিয়া গলিয়া গিয়া সেই সময়ে ইচ্ছাবশতঃ দান করিতেন—তাহা নহে। তাঁহার স্বভাবই—পরম দয়ালু। দানশীলতা তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই মহৎ গুণেই তিনি সর্ব্বদা—সকল অবস্থাতেই দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

তাঁহার দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিল—তাহাদের সকলের সঙ্গেই মহসীন নিতান্ত মিষ্ট ও সদয় ব্যবহার করিতেন। কোন কারণেই কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া বা রাগ করিয়া তিনি কঠিন বা কর্ক্কশ ব্যবহার করেন নাই। এই কারণে সমস্ত সংসার আপনা হইতেই তাঁহার পরম অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহম্মদ মহসীন নিজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পরম পণ্ডিত হইয়া শিক্ষা-লাভের গুণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের লোক যতই উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে, ততই তাহাদের নিজের জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাজের এবং দেশের উন্নতি করিতে পারিবে। এইজন্য তিনি হুগলীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যালাভের পথ খুলিয়া দিলেন। সে বিদ্যালয়ে জাতিবিচার

রহিল না, কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকল ছাত্রগণই সমানভাবে বিদ্যালাভ করিতে লাগিল।

তাহা ছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসাগুলির উন্নতি করিবার জন্য তিনি মুক্তহস্তে যথেষ্ট দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে এদেশে মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষালাভের পথ বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সর্ব্বদা চারিদিকে এত প্রকারে এত দান করিয়াও দানবীর মহসীন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। যিনি দয়ার অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ফোয়ারার জল-ধারার মত সর্ব্বদাই যাঁহার দানের ইচ্ছা আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—তিনি দান করিয়া শেষ করিবেন কেমন করিয়া? অবশেষে ইংরাজী ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এক উইল করিয়া তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি সমস্তই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

তাঁহার এই মহাদানের ব্যাপার দেখিয়া সমস্ত সংসারের লোক একেবারে অবাক হইয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল—মহম্মদ মহসীন মানুষ না দেবতা? যিনি এই কুবেরের সম্পদরাশির একমাত্র অধিকারী হইয়া, নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও না রাখিয়া যথাসর্ব্বস্ব ধর্ম্মের জন্য—পরোপকারের জন্য দান করিতে পারেন, তিনি যে আমাদেরই মত মানুষ ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

মহম্মদ মহসীনের কাছারিতে—বহুলোক কর্ম্ম করিত। তাহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে মহসীনও অনেকটা হিন্দুদের মত ছিলেন। তিনি মাথা মুড়াইয়া, গোঁফদাড়ি ফেলিয়া পরম শুদ্ধ শান্তভাবে কর্ম্মচারীগণের মধ্যে বসিয়া যখন বিষয়-কর্ম্মের আলোচনা করিতেন, তখন দেখিলে কেহই তাঁহাকে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারিত না।

উইলে তিনি এই সকল কর্ম্মচারীকেও বাদ দিলেন না। তাঁহার কাছারীর খরচ ও কর্ম্মচারীগণের বেতন প্রভৃতি বাবদ মাসে মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহার সংসারের ব্যয়ের খরচের জন্যও ব্যবস্থা রহিল। তা ছাড়া মহসীনের বিস্তর মাসিক বৃত্তি-দান ছিল। বহু দরিদ্রব্যক্তি যথানিয়মে মাসে মাসে মাসোহারা পাইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইত। উইলে তিনি সেই সব মাসোহারাও বজায় রাখিলেন। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে সুবন্দবস্ত করিয়া, উইল লিখিয়া সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ধর্ম্মকার্য্যে দান করার পর হইতে মহসীনের মুখে এক দিব্য শান্তির আলো ফুটিয়া উঠিল। দানবীর সেই মহৎ দান-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া যে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিলেন তাহা এ জগতে দুর্ল্লভ।

মহম্মদ মহসীন বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তা বলিয়া বিলাসিগণের বৈঠকের খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গীতে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিত না, বরং সে সকলের নাম শুনিলেও তিনি মনে মনে ঘৃণা করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেন। কিন্তু যেখানে কেহ ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিতেছে, কেহ দেবতার উদ্দেশে সুর করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে—কেহ মধুরকণ্ঠে কোরাণের বা হিন্দু শাস্ত্রের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে—সেখানে তিনি বিভোর হইয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে এমনি আত্মহারা হইয়া ভগবানের উপরে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিতেন যে, তখন তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া শত ধারায় আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

ভোলানাথ সিংহ নামক যশোহরের এক ব্যক্তি খুব ভাল ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও কীর্ত্তন প্রভৃতি গাহিতে পারিত। মহসীন তাহাকে আনাইয়া পরম সমাদরে আপনার কাছে রাখিয়াছিলেন। বিষয়-কর্ম্মের অবসানে অবসর পাইলেই একমনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ভোলানাথের গান শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে ঈশ্বরের প্রেমে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যাইতেন। তখন ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যাইত না। কেবল

উপরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন আর বুক বাহিয়া জলধারা পড়িত।

মহসীন মুসলমান হইলেও হিন্দুদের শাস্ত্র অত্যন্ত মান্য করিতেন এবং সে সকলের উপদেশ অমূল্য বলিয়া ভাবিতেন এবং সকলকে কহিতেন। নিজে তিনি বরাবর নিরামিষ আহার করিতেন এবং সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতেন। জীবনে কখনও কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতেন না, এবং আপনার অধীনস্থ কাহাকেও করিতে দিতেন না। এইরূপে তাঁহার চারিদিক বেড়িয়া সর্ব্বদাই নম্রতা, সব্বদাই সততা, সর্ব্বদাই সাধুভাব এবং শান্তি বিরাজ করিত।

মহম্মদ মহসীনের আর এক মহৎ গুণ যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমানগণকে কখনও ভিন্ন ভাবে বা ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার কাছে সকলেই সমান, সকলেই সেই এক জগৎপিতার সন্তান, সকলেই ভাই-ভাই ছিল। সুতরাং তিনি হিন্দু ও মুসলমানগণকে সর্ব্বদাই এক প্রেমসূত্রে বাঁধিয়া রাখিতেন এবং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতি জন্মে তাহারই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে, তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারী সকলেই পরস্পরের প্রতি বিশেষ স্নেহবান ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

মহম্মদ মহসীনের দানের কথা এবং মহত্ত্বের কথা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার অন্তরে যে প্রকার বজ্রশেল বিঁধিত, দুঃখীর রোদনে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া যে প্রকার শতধারা ছুটিত, ব্যথিতের বেদনায় তিনি যে প্রকার কাতর হইয়া পড়িতেন—সে রকম আর কাহারও শুনিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য, নির্বিচারে ভেদাভেদ শূন্য হইয়া—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইতর কি ভদ্র, সকলেরই দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি যেরূপ স্ব-ইচ্ছায় আপনার

যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এ সংসারে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই।

মন্নুজান মৃত্যুর পূর্ব্বে—ভ্রাতাকে বহুচেষ্টায় বিদেশ হইতে ঘরে আনাইয়া যখন তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তখনও সেই মহাপুরুষ নিজে যেমন সম্পূর্ণ স্পৃহাশূন্য থাকিয়া কেবল পরোপকারকেই জীবনের একমাত্র মহাব্রত বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে ইংরাজী ১৮০৩ সালে মন্নুজানের মৃত্যু হইলে মহসীন যখন স্বয়ং সেই অগাধ-সম্পদরাশির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন—তখনও তিনি নিজে সেই রকম স্পৃহাশূন্য থাকিয়াই কেবল পরোপকারেই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাই প্রকৃত মহত্ত্ব। এরূপ মহত্ত্বের কাছে দেবত্বও মাথা নোয়াইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু শুধু পরোপকারী, দানবীর, মহাপুরুষ বলিলেই মহসীনের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হওয়ার পর হইতে মহসীন আর আপনার ছিলেন না—আপনাকে পরের হাতে বিলাইয়া দিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরেরই হইয়া গিয়াছিলেন। তাই এ সংসারে যাহা কিছু তাঁহার আপনার বলিবার ছিল, যাহা কিছুর উপরে তাঁহার নিজের অধিকার ছিল—সে সমস্তই পরকে বিলাইয়া, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল পরের কার্য্য—পরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মদানের কাহিনী জগতের ইতিহাসে বিরল।

---

## নবম পরিচ্ছেদ

উইল করিয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব ধর্ম্মকার্য্যে পরের সেবায় বিলাইয়া দিবার পরে মহসীন কেবল ছয় বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি নিজেই আপনার উইলের বিধান অনুসারে কার্য্য

করিতে লাগিলেন। দীন দুঃখী, আতুর কাঙ্গাল, পীড়িত, ব্যথিত, শোকতপ্ত—সকলেই সংসারে সুখের মুখ দেখিলেন, সকলেই সেই মহাপুরুষকে স্নেহবান পিতারূপে পাইয়া আপনাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া লইল। দুঃখীর সংসারে আনন্দের স্রোত বহিল, মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সংসার হইতে দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপের চিহ্ন যেন মুছিয়া গেল।

কিন্তু ভগবান বেশী দিন তা রাখিলেন না। ইংরাজী ১৮১২ সালে সেই দয়ার অবতার, নরদেবতা, সংসারের সকলকে কাঁদাইয়া চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হুগলীতে মন্নুজানের মৃত দেহ যেখানে কবর দেওয়া হইয়াছিল—তাঁহার পার্শ্বে মহাপুরুষ মহসীনের কবর-শয্যা স্থাপিত হইল। তাঁহার মৃত্যুতে হুগলীনগরে যে শোকের ঝড় বহিল তাহা আর শীঘ্র থামিল না, সমস্ত হুগলী যেন অন্ধকার হইয়া গেল।

মহসীন যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন রজবআলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁ নামক যে দুইজন ধর্ম্মবন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই তিনি উইলে তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উইলে তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ রহিল যে তাঁহারা দুইজন একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে এই বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিবেন এবং যথারীতি বছর-বছর গবর্ণমেণ্টের খাজানা দিয়া বাকী টাকার নয় ভাগ করিবেন। এই নয় ভাগের দুই ভাগ তাঁহারা দুইজন আপনাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। বাকী সাত ভাগের তিন ভাগ ইমামবাড়ী ও মসজিদ সকলের সংস্কার ও উন্নতির জন্য এবং মহরম প্রভৃতি উৎসবে ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে। বাকী যে চার ভাগ থাকিবে, তাহা হইতে তাঁহার কর্ম্মচারীগণের মাসিক বেতন, তাঁহার সংসারের খরচপত্র এবং তিনি যে সকল লোকের মাসিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন—সেই সকল দেওয়া হইবে।

যদি এই অভিভাবক দুইজনের কেহ কোন কারণে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন, তাহাহইলে তিনি অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করিয়া নিজে অবসর লইতে পারিবেন।

মহসীনের মৃত্যুর পর তিনবৎসর ধরিয়া ইংরাজি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রজবআলি খাঁ ও সাকেরআলি খাঁ উইলের আদেশ অনুযায়ী কর্ম্ম করিলেন। কিন্তু অর্থই মানুষের যত অনর্থের মূল, ইহাই ভাল মানুষকেও বিগড়াইয়া দেয়। সেই সময়ে ঐ দুইজন অভিভাবকের নামে নানারূপ কথা রটিতে লাগিল, এমনকি অনেকে সন্দেহ করিলেন যে মহসীনের উইলের আদেশ মত ঠিক কার্য্য হইতেছে না।

যখন এরূপ কথা রটিল, তখন গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইলেন এবং উক্ত রজবআলি ও সাকের আলি ঠিক উইলের আদেশ মত কার্য্য করিতেছেন কি না তাহা দেখিবার জন্য ইংরাজী ১৮১৫ সালে সৈয়দ আকবরআলি খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন।

আকবর আলি খাঁর পরিদর্শনের গুণে রজবআলি ও সাকের-আলির কতকগুলি বিশেষ দোষ ও কার্য্য-সম্পাদনে অনেক রকম গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলা বাহির হইয়া পড়িল। পাছে সরকার বাহাদুর এ বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে জবাবদাহিতে ফেলেন, সেই ভয়ে উক্ত রজবআলি এবং সাকের আলি দুইজনই কিছুকালের জন্য কার্য্য ফেলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

কাজেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া সরকার বাহাদুর সেই আকবরআলি খাঁকেই সেই পদে নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তির অভিভাবক করিলেন। তখন রজবআলি ও সাকেরআলি আর গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা দুইজনে একযোগে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ রুজু করিলেন।

ঘোরতর মোকদ্দমা বাধিয়া উঠিল। এখানকার আদালতের বিচারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না—বিলাতে পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। এইরূপে সতের বৎসর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিয়া বিলাতের "প্রিভি কাউন্সিলে" তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইয়া গেল। তাহার ফলে রজব আলি ও সাকের আলি সম্পূর্ণরূপে হারিলেন। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সম্পত্তির দেখাশুনা ও বন্দোবস্ত করিবার ভার পাইলেন।

এই দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমার সময়ে সম্পত্তির আয় হইতে সমস্ত খরচ-পত্র বাদে তহবিলে প্রায় নয়লক্ষ টাকা জমিয়া গেল।

নয়লক্ষ টাকা বড় সহজ টাকা নহে। উহা ওইভাবে জমাইয়া রাখিলে মৃত মহাপুরুষের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সুতরাং ওই টাকা গবর্ণমেণ্ট এ দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সাহায্যে ব্যয় করিতে চাহিলেন। স্থির হইল যে, ঐ টাকায় হুগলীতে উপযুক্ত জায়গা জমী ও বাড়ী করিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

সরকার বাহাদুরের এই মহৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে নানা প্রকার আপত্তি উঠিতে লাগিল। সকলে কহিল যে—মহসীন যখন কেবল ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য ঐ সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন তখন তাহাতে কালেজ করা হইতে পারে না, উহা কেবল ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় করা হউক।

শেষে বহু তর্ক ও বিচারের পর স্থির হইল যে, পরসেবা ও দেশের সেবা পরম ধর্ম্মকার্য্য। স্বয়ং মহসীন দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং দেশের, সকলেই যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করে, সে চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিয়াছেন। সুতরাং ঐ টাকায় কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ করা হইবে।

অবশেষে তাহাই হইল। সেই টাকায় হুগলীতে প্রকাণ্ড জমী ও বাটী ক্রয় করিয়া সেই স্থানে ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এখনকার এই

"হুগলী কালেজ" সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহসীনের নামও স্বদেশ ও বিদেশবাসীর অন্তরে অঙ্কিত হইয়া গেল।

## দশম পরিচ্ছেদ

মন্নুজানের পিতা আগামতাহর হুগলীতে একটি ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন উন্নতি করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার ভাগিনেয় ও জামাতা—মন্নুজানের স্বামী—সলাউদ্দীন কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার কতকটা উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির অনেক বাকী ছিল।

মহসীনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সেই ইমামবাড়ী এরূপ করিবেন যেন উহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার জীবনকালে তিনি ইচ্ছামত সে কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে, উইলের অভিভাবক রজবআলি এবং সাকেরআলি তো তাহাতে হাতই দেন নাই, সরকার বাহাদুরও মহসীনের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার নানা গোলোযোগে এবং মামলা-মোকদ্দমার জন্য মৃত মহাপুরুষের সে মহৎ ইচ্ছা পূরণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অবশেষে 'হুগলীকালেজ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সে কার্য্য আরম্ভ হইল। অনেক দিন ধরিয়া বিস্তর অর্থব্যয়ে ইমামবাড়ীর সংস্কার, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি হইয়া ইংরাজী ১৮৬১ সালে সেই অট্টালিকার সম্পূর্ণ নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল। তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে সুদৃশ্য, সুন্দর, কারুকার্য্যশোভিত প্রকাণ্ড ইমামবাড়ীর আর তুলনা রহিল না। সেই

হইতে "হুগলীর ইমামবাড়ী" ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া চিরকালের জন্য হাজি মহম্মদ মহসীনের নাম, মহত্ত্ব এবং আদর্শ দানের কথা দেশ-বিদেশে কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

প্রকৃতপক্ষে "হুগলীর ইমামবাড়ী" এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার। যিনি স্বচক্ষে তাহা না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া বুঝানো অসম্ভব। সম্মুখে সুন্দর রাজপথ, ও পশ্চাতে নৃত্যশীলা গঙ্গা, এই ইমামবাড়ীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন শতগুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তেমনি ভিতরের সৌন্দর্য্যে কোনখানে কোন অংশে ইহা কম নহে।

ইহার সিংহদ্বারের দুইপার্শ্ব হইতে দুইটি বৃহৎ উচ্চ চূড়া যেন আকাশ স্পর্শ করিতে ছুটিয়াছে—তাহাদের উপরে এক প্রকাণ্ড ঘড়ি। দ্বারে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের সম্মুখেই নানা কারুকার্য্যশোভিত প্রকাণ্ড ভজনালয় এবং তিন দিকে উচ্চ দ্বিতল অট্টালিকা। প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি জলাশয়ে নানাবিধ মৎস্য মনের সুখে খেলিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহার মধ্যে সুন্দর ফোয়ারা হইতে জলধারা উপরে উঠিয়া আবার জলাশয়েই পড়িতেছে। চারিদিকের সমস্ত অট্টালিকার প্রাচীরের গাত্রে শত শত কোরাণের শ্লোক এবং মহসীনের অদ্ভুত দান-যজ্ঞের কথা খোদিত রহিয়াছে।

ভজনালয়টি আবার মার্ব্বেল পাথরে প্রস্তুত। সেখানে সাদা, লাল, নীল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি নানা বর্ণের দীপাধার সজ্জিত। সেই আলোকসকল প্রজ্জ্বলিত হইলে, সে গৃহে যেন শত শত বিচিত্র বর্ণের রামধনুর হাট বসিয়া যায়। সেই বিচিত্র আলোরাশির তরঙ্গের মধ্যে বসিয়া যখন শত শত উপাসক একমনে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন—তখন সেখানে এক অপূর্ব্ব শান্তির ছটা যেন আপনা হইতেই চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া তোলে। মনে হয়, ভগবান স্বয়ং তাঁহার সমস্ত

স্বর্গের ঐশ্বর্য্যরাশি লইয়া বুঝি সেইখানে আসিয়া—শান্তির রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছেন।

শুধুই কি তাই? সেই সুন্দর ইমামবাড়ীর ভিতরের অট্টালিকা সকলের মধ্যে, কোথাও বা অতিথিশালা, সেখানে শত শত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি প্রত্যহ অন্ন পাইতেছে, কোথাও মুসাফীরখানা—সেখানে শত শত বিদেশী লোক আশ্রয় পাইতেছে, কোথাও আতুরাশ্রম—সেখানে প্রত্যহ শত শত দরিদ্র আতুর সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য পাইয়া বাঁচিয়া যাইতেছে, আবার কোথাও বা, জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ কোরাণপাঠ এবং ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া সংসারের শোকতাপ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপে হুগলী সহরের একদিকে উচ্চশিক্ষাদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় "হুগলীকালেজ" স্থাপিত হইয়া দেশবাসীকে যেমন নিত্য নিত্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে সেই সঙ্গে আবার তেমনি ধর্ম্মের উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য—প্রকাণ্ড ভজনালয়, দীন, দুঃখী, আতুরের সেবাস্থল, ধর্ম্মশিক্ষা দিবার প্রশস্ত বেদী প্রভৃতি সম্বলিত অতুলনীয় ইমামবাড়ী মহসীনের কীর্ত্তিগাথা প্রতিনিয়ত প্রচার করিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে উন্নতি সাধন করিয়া মানুষ হইবার যে দুইটি সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় ও পথ—মহাত্মা মহসীনের অপূর্ব্ব দানের ফলে সেই দুই পথই দেশবাসীর সম্মুখে প্রশস্তভাবে মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার অপেক্ষা মানবসমাজের অধিক উপকার কি দেবতারাও করিতে পারেন? এই মহৎ উপকারের একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং আদর্শ উপকারী মহাপুরুষই সেই হাজি মহম্মদ মহসীন।

মহসীনের অসীম দানের ফলে শুধু যে এই দুইটিমাত্র মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহা নহে। সংসারে কত দিকে, কত বিষয়ে,

কত প্রকারে যে নিয়ত প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।

মহসীনের সম্পত্তির আয় হইতে দেশে মুসলমান বালকগণের নানাপ্রকারে শিক্ষার সাহায্য হইতেছে, কত শত ধর্ম্মশালার উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্মচর্চ্চার উপায় বৃদ্ধি হইয়াছে, শত সহস্র দীন দুঃখী গৃহহীন পথের কাঙ্গাল রক্ষা পাইতেছে। তাহা ছাড়া হুগলীর প্রকাণ্ড দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাঁসপাতাল তাঁহার অর্থেই স্থাপিত হইয়া দেশবাসীর যে নিত্য কি অসীম উপকার সাধন করিতেছে তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। বস্তুতঃ হুগলীতে যে কোন প্রকার মানবের হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে—সে সকলই মহসীনের দানের ফলে।

হাজি মহম্মদ মহসীন, মুসলমান সমাজের পরম গৌরবস্থল, বঙ্গদেশের পরম গৌরবস্থল, সমগ্র বঙ্গবাসীর পূজার দেবতা। যে দেশে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হয় সে দেশ ধন্য—দেশবাসী ধন্য! সামান্য মানব-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে অসীম যশঃ, অক্ষয় কীর্ত্তি, ও অমর নাম দেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেবতারাও পারেন কিনা সন্দেহ! যতদিন দেশে মানুষ থাকিবে, যতদিন মানুষের ইতিহাস থাকিবে, ততদিন হাজি মহম্মদ মহসীনের পুণ্যময় নাম বিলুপ্ত হইবে না।

সম্পূর্ণ

# তিন-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলী।

১। বিদ্যাসাগর

২। মাইকেল মধুসূদন

৩। বঙ্কিমচন্দ্র

৪। রাজা রামমোহন

৫। কেশবচন্দ্র

৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ

৭। নেপোলিয়ন

৮। রমেশচন্দ্র দত্ত

৯। রামদুলাল সরকার

১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

১১। কৃষ্ণদাস পাল

১২। মহম্মদ মহসীন

১৩। আনন্দমোহন

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ